দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সামাজিক খাতে জাতীয় বাজেটের প্রায় ২৪ শতাংশ অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহে ব্যয় করা হচ্ছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬৩ শতাংশ শিক্ষকই মহিলা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দুবার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে। নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন -২০১০'। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা -২০১১'। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়াও, প্রণীত হয়েছে 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪'। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report, 2016' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report, 2016' অনুযায়ী ২০১৬ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম, যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ মধ্যম পর্যায়ে অবস্থান করছে। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা, ভারত ও ভূটান বাংলাদেশের চেয়ে অগ্রবর্তী অবস্থানে রয়েছে। অপরদিকে, নেপাল এবং পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে নিচে অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত দুই দশকে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০০৫	২০০৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সূচকের মান	০.৪৫৩	০.৪৯৪	০.৫১৫	০.৫৩৯	০.৫৪৯	০.৫৫৪	০.৫৫৮	০.৫৭০	০.৫৭৯	০.৫৭৯

উৎসঃ Human Development Report, 2016. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। চলমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২৪ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই

জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতি বছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। চলতি অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ৭১,০৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৭.৭৫ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখচিত্র ১২.১ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

(কোটি টাকা)

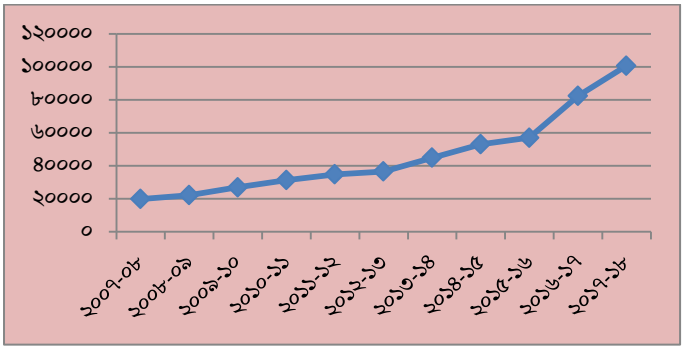

*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১২০	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**২২১২০**	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

কর্মমুখী, বিজ্ঞানমনস্ক, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'রূপকল্প-২০২১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজ ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধান নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতি,বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক

শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণের অধিকার দিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট ২২,০২২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির' কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি'-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পসহ আরও কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৩,৯০১টি (ব্র্যাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বেশি। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা ৪৯.৩২ঃ৫০.৬৮-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)	৮৭.২
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮ (৪৯.৩০)	৮৭.৪৭ (৫০.৬৮)	৯৭.৯৭

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকারের নেয়া নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮

উৎসঃ Annual Primary School Census, 2017, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সারণি ১২.৪ থেকে দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার প্রায় ৩২ শতাংশ কমেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৩.৮২:৩৬.১৮ ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড' গঠন করা হয়েছে।
- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে সুবিধাভোগীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে মোট ১.৪ কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০৪টি উপজেলার ৩১.৬২ লক্ষ শিশুদের স্কুল খোলার দিন জনপ্রতি ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের সরকারিকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ২৬,১৫৯টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।

প্রাথমিক অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত-

- 'পিইডিপি-৩' এর আওতায় ৩টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ৭,৪৮৫টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৯৩টি বিদ্যালয়ে বড় ধরনের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।
- ৬,৫৭৯টি গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪,৪১৬টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- পিটিআই বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরের মধ্যে ১১টিতে পিটিআই স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত ১,৪৭০ বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ২৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান আছে।
- ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এর সহায়তায় ১৭০টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৭ সালের পঞ্চম শ্রেণির

সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ২৬.৬৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং ৯৫.১৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করে। অন্যদিকে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২.৫৪ লক্ষ এবং এ পরীক্ষায় ৯২.৯৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করে।

বর্তমানে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তির সংখ্যাও প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে মোট ৮২.৫ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩ হাজার। সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে মোট ৪৯.৫ হাজার শিক্ষার্থী। এছাড়াও, দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট্রের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় পর্যায় (২০১৫-২০১৯) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সারা দেশে মোট ১.৪ কোটি শিক্ষার্থীকে প্রকল্পের আওতায়ভুক্ত ধরা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির এক সন্তানের জন্য ৫০ টাকা, দুই সন্তানের জন্য ১০০ টাকা, তিন সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা এবং চার সন্তানের জন্য মাসিক ১৫০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই বৃত্তির হার এক, দুই, তিন ও চার সন্তানের জন্য যথাক্রমে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ২৫০ টাকা এবং ৩০০ টাকা। অন্যদিকে, ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এক সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা, দুই সন্তানের জন্য ২৫০ টাকা, তিন সন্তানের জন্য ৩৫০ টাকা এবং চার সন্তানের জন্য মাসিক ৪০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রতিবছর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্য বই তুলে দেয়া হচ্ছে। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১০.৩৬ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৩৪.১১ লক্ষ বই এবং প্রায় ৩৪.১১ লক্ষ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৮ সালেই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী) শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৪ হাজার বই, সমসংখ্যক অনুশীলন খাতা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রথম শ্রেণির জন্য ৮০ হাজার বই বিতরণ করা হয়েছে।

সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি

ইতঃপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ছিল ৫৯৫ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ৮৩৩ ঘণ্টা ছিল। পরবর্তীতে প্রায় ৪ হাজার দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রুপান্তরিত করা হয়। এর ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে বার্ষিক সংযোগ সময় বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮২ ঘণ্টা এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে ১,৪৭৭ ঘণ্টা হয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণি এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে বার্ষিক সংযোগ সময় যথাক্রমে ৭১৪ ঘণ্টা এবং ৭৮৩ ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিকা ও শিক্ষকের আনুপাতিক হার প্রায় ৬৪: ৩৬। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ৩৭,৮০৯ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরো প্রায় ১০,০০০ সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এরূপ ৬৬৭টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৫ জন করে সর্বমোট ৩,৩৩৫টি শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । দেশের ১৪৮টি উপজেলায় ২১,৩৬১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত কিংবা ঝরে পড়া

শিশুরা ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৮০ টাকা হারে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জনপ্রতি ১০০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ইউনিফর্ম বাবদ বছরে জনপ্রতি ৪০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর ২০০ টাকা এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তিকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে ভর্তি সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ২,০০০ টাকা সহায়তা দেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৯৮ হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে।

এছাড়াও, ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সেকেন্ড চান্স বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলছে। মৌলিক সাক্ষরতা নামক আরেকটি প্রকল্প ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনলাইন বদলী কার্যক্রম অন্যতম । অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন ও আইসিটি সামগ্রী প্রদান, আইসিটি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও উন্নততর পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে Institutional Self Assessment Summary (ISAS) র‍্যাংকিং এর ভিত্তিতে ক্যাটাগরি নির্ধারণ, পিবিএম ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করাসহ বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়াও, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এর আওতাধীন ২৪,৬৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩,৬০,৮৯০ জন শিক্ষক এবং ১,৩৯,৫২,১৪৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

নারী শিক্ষা বিস্তার এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সভা সমাবেশ, সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাউশি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বাস্তবায়নাধীন 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)' এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ কাজ চলছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন এন্ড অ্যাকসেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)' প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস (ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান) গ্রহণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেকায়েপ প্রকল্পের আওতাভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯,৪৪৭ জন (গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে) অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১১,৯৮২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৩,১৪,২৮৭টি বই সরবরাহ এবং পুরস্কার হিসেবে ৩৫,৬৬,৪১২টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩১০টি মডেল বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। 'ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি হাই স্কুল স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫টি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ চলছে। 'সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন'

প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ শেষ হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি শতকরা ২০ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরীর বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত মোট ৮,৬৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি ৬০০টি এবং বেসরকারি ৮,০৪৪টি। এছাড়া, কারিগরি ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চলমান আছে। এছাড়া, নব প্রতিষ্ঠিত বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগ চালু করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও, ২৩টি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য পৃথক প্রকল্প সরকার অনুমোদন করেছে। বিদ্যমান টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়াও, ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া, নতুন করে আরও ৩৮৯টি উপজেলায় ১টি করে টিএসসি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ (BITTTR) স্থাপন এবং কক্সবাজার টিএসসি প্রাঙ্গনে কারিগরি শিক্ষক লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার কলেবর বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত, সুষ্ঠু তদারকি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ১০ হাজার এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএ'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasha Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সব জেলাতেই একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে নতুন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে পন্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

'Cross Border Higher Education (CBHE)-2014' আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলাদেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 'Higher Education Quality Enhancement (HEQEP)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষক আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে 'হাইয়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকাপ) প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা স্বরুপ 'Higher Education Management Information System (HEMIS)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হেমিস পোর্টালের মাধ্যমে অন-লাইনে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডাটা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হেমিস এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ডাটা সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া হেকাপ প্রকল্পের অর্থায়নে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ইউডিএল এর সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৮। সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল এর মাধ্যমে ই-বুকস ও ই-জার্নাল ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন। ইউডিএল এর ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারীগণ সরাসরি ই-রিসোর্স প্রোভাইডারদের পোর্টালে প্রবেশ করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে 'Trans Eurasia Information Networks (TEIN)' এর সদস্যপদ ও অংশীদারিত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের ৩৪টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় TEIN এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জ্ঞানভান্ডারের সাথে যুক্ত হয়েছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)' এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের ই-লার্নিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ জন্যে সারাদেশে ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হবে । ইতোমধ্যে ২৭০টি প্রতিষ্ঠানে এ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭০টি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান আছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি কলেজে আইসিটি বিষয়ক ২৫৫টি প্রভাষক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (TQI-II)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়্যার, ট্রাবলশুটিং এবং এ্যাডভান্সড আইসিটি ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩টি বিষয়ে ই-ম্যানুয়েল (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ছয়টি বিষয়ে ই-লার্নিং (ইংরেজি, গণিত ও হিসাববিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান) উপকরণ উন্নয়ন ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

'এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২)' প্রকল্পের অধীনে ৩১টি ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশ গমনেচ্ছুকদের ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিয়ে দক্ষ সম্পন্ন জনবল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট ২৫ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

মাউশি'র আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত মোট ১,০৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,০৮৩টি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব ল্যাবরেটরিতে এখন পর্যন্ত মোট ২৫,০৯০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। আরও ৯৭৬টি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাউশি'র এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের গতিশীলতা আনয়ন এবং উপকারভোগীদের হয়রানি হ্রাসের লক্ষ্যে অনলাইন এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের বেতন-ভাতাদি অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফিও প্রদান করা হয়। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদের জন্য সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত হয়েছে। পূর্বে এ পরিমাণ ছিল ১০ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বিগত কয়েক দশকে স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০০-১৫ মেয়াদে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ে অর্জন করায় বাংলাদেশ পরপর দুইবার 'জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ও সরকার একসাথে স্বাস্থ্য সেক্টরের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। এর ফলে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, অর্থায়ন সকল ক্ষেত্রেই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও সকলস্তরে কার্যকারিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
স্থূল জন্মহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	১৯.২	১৮.৯	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭
	শহর	১৭.৪	১৭.১	১৮.২	১৭.২	১৬.৫	১৬.১
	গ্রাম	২০.২	২০.০	১৯.৩	১৯.৪	২০.৩	২০.১
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	৫.৫	৫.৩	৫.৩	৫.২	৫.১	৫.১
	শহর	৪.৮	৪.৬	৪.৬	৪.১	৪.৬	৪.২
	গ্রাম	৫.৮	৫.৭	৫.৬	৫.৬	৫.৫	৫.৭
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৩.৯	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২
	নারী	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৪	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৮৬০	২৮৬০	২৮৬০	২১২৯	২৬২৮	২০৩৯
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৯.০	৬৯.৪	৭০.৪	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬
	পুরুষ	৬৭.৯	৬৮.২	৬৮.৮	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩
	মহিলা	৭০.৩	৭০.৭	৭১.২	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৫	৩৩	৩১	৩০	২৯	২৮
	শহর	৩২	৩১	২৬	২৬	২৮	২৮
	গ্রাম	৩৬	৩৪	৩৪	৩১	২৯	২৮
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪৪	৪২	৪১	৩৮	৩৬	৩৫
	শহর	৩৯	৩৭	৩৫	৩০	৩২	৩২
	গ্রাম	৪৭	৪৪	৪৩	৪০	৩৯	৩৬

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	২.০৯	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩	১.৮১	১.৭৬*
	শহর	১.৯৬	১.৯০	১.৪৬	১.৮২	১.৬২	১.৬০
	গ্রাম	২.১৫	২.১০	২.১১	১.৯৬	১.৯১	১.৯০
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		২.১২	৬২.২	৬২.৪	৬২.২	৬২.১	৬২.৩
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১১	২.১২	২.১১	২.১১	২.১০	২.১০

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2016. * স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)' শীর্ষক চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও, সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করতে কর্মসূচিটি কাজ করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

কমিউনিটি ক্লিনিক

প্রান্তিক পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের অনন্য উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মত গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ সাল পর্যন্ত ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়। পরবর্তীতে ২০০১-২০০৮ মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাদান কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পুনরায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে 'Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বহিঃবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি সেবা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ, উচ্চতর পর্যায়ে রেফারেল সেবা প্রদান করে থাকে।

সারাদেশে মোট ১৪,৮৯০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৩,৫৯৫টি নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২,৯১৪টিতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ২৭ প্রকার ঔষধ ও ২ প্রকার পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনীতিতে উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু এবং সার্স রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । এছাড়া, শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচি,বয়:সন্ধি স্বাস্থ্য কর্মসূচি, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদেরকে রোগমুক্ত রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া,

হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষ্মা ও হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোক্কাল নিউমোনিয়া, রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকাপ্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিডি-১ (%)	ওপিডি-২ (%)	ওপিডি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.০	৯২.০	৯১.০	৯৩.০	৯২.০	৮৬.০	৮১.০
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪.০	৯১.০	৯৩.০	৯৩.০	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪.৭	৯৪.৭	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৮৬.৬	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৫	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৮৭.৫	৮২.৩

উৎসঃ Bangladesh EPI CES ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ,২০১৪, ২০১৫, ২০১৬।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু, কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্টদের (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম প্রবর্তন, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের আগাম সনাক্তকরণ কার্যক্রম সরকার বাস্তবায়ন করছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৪১টি জেলায় সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় ব্যাপক আকারে মাতৃ, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (MNCH) বাস্তবায়ন করছে। জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstretic Care (EmOC) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩টি সাধারণ হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬৩টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstretic Care (CEmOC) এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstretic Care (BEOC) সেবা চালু আছে। EmOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার মোট প্রসবের ০.১৭ শতাংশ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার মোট জীবিত জন্মের ২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএসবিএ এবং মিডওয়াইফদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফারির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসডিপি'র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান। এছাড়াও, কর্মসূচিটি দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে কাজ করে। এ কার্যক্রমের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হলো অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করা। দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Severe Acute Malnutrition (SAM) ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। জেলা সদর ও উপজেলা হাসপাতালে ২৫২টি SAM Unit স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টিরোধ করার জন্য জেলা সদর ও উপজেলা হাসপাতালে ৩৯৫টি Integrated Management of Childhood Illness Programme (IMCI) এবং পুষ্টি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, জনগণের আচরণ পরিবর্তনে প্রচারণামূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম যথা শিশুর খাবার ও পুষ্টি বিষয়ক

টিভি স্পট, মাল্টিমিডিয়া, উপজেলায় বিলবোর্ড স্থাপন, রেডিও স্পট ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অপুষ্টির ঘাটতি ও নিরাময় কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	২৫%	চলমান
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২	-	৩৬.১	২৫%	চলমান
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪	-	১৪.৩	<১০	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	-	২২.৬	<১৮%	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫০.৮	৬০%	চলমান
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২	<১%	চলমান
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	-	৮২	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫.৩	৬৫%	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৯২*	>৯০%	চলমান

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্যবীমা

স্বাস্থ্যখাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage-UHC) নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের তিনটি উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)' নামে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি রোগের আন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসা প্রদান করা হবে। এছাড়া, 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১' অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল শ্রেণির জনগণকে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য খাতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। সরকার ইতোমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের ল্যাপটপ এবং এন্ড্রয়েড ট্যাবলেট প্রদান করেছে। প্রত্যেক গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। প্রত্যেক নাগরিককে একটি অভিন্ন 'Health Identifier Code' প্রদান করা হচ্ছে। এটি জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটা বেজের সাথে সংযুক্ত করে স্থায়ী স্বাস্থ্য বিবরণী তৈরির সফটওয়্যার ডিজাইনে ব্যবহার করা হবে। জাতীয় ই-হেলথ পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তি কার্যক্রম, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ডাক্তারদের ছুটি ও ডেপুটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, সকল ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। হাসপাতালগুলোতে উন্নত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে নাগরিকদের অনলাইনে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটি সার্বক্ষণিক কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি 'Skype Based Teleconsultation' পদ্ধতিও চালু হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকরী উদ্যোগের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ সালে যেখানে মোট প্রজনন হার ছিল ৩.০, বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২.৩ এ দাঁড়িয়েছে। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬২.৪ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে, অথচ ২০০১ সালে এ হার ছিল ৫৩.৮ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ক্রমশ কমছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৭। বর্তমানে তা কমে হয়েছে ১.৩।

২০২২ সালের মোট প্রজনন হার ২ এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬২.৪ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ এবং দেরীতে প্রথম সন্তান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সময়মত সঠিক পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও সার্বক্ষণিক প্রসব সেবা প্রদানের কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৭৬ এবং প্রতি হাজার জীবিত জন্মে শিশু মৃত্যুর হার ৩৫।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশই কিশোর-কিশোরী। বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা কেন্দ্রগুলোকে কৈশোর বান্ধব করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার খোলা হয়েছে।

৩,১৭৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেশে গ্রাম পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং সার্বক্ষণিক জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক 'Emergency Obstretic Care' (EOC) সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ১২টি উপজেলা এবং ২৪টি ইউনিয়নসহ দেশব্যাপী সর্বমোট ৯৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। তাছাড়া, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১০ শয্যাবিশিষ্ট নতুন আরো ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত ১০টি জেলা এবং ১১০টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার মিরপুরে একটি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইউনিট নির্মাণ করা হচ্ছে।

শহরাঞ্চলের বস্তি, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বহুবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও সরকারের একার পক্ষে দেশের সব মানুষের চাহিদা মাফিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই সরকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিশেষত স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ডায়রিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে । স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে, স্বাস্থ্য খাতে পিপিপি'র আওতায় মোট ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে 'চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' এবং 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিস এন্ড ইউরোলজি, ঢাকায় কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' প্রকল্প দুটি উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারেও সরকার বদ্ধ পরিকর। দেশে সরকারিভাবে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। একইভাবে বেসরকারি উদ্যোগেও নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এতে করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

২০০০ সাল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি মিলে দেশে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ২৯টি। বর্তমানে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৬ এ। এর মধ্যে সরকারি মেডিকেল

কলেজ ৩১টি, আর্ম ফোর্সেস ও আর্মি মেডিকেল কলেজ ৬টি। অবশিষ্ট ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। এছাড়া, বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৪টি ডেন্টাল কলেজ ও ১০টি ডেন্টাল ইউনিটে বিডিএস কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ। বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি সর্বসাকুল্যে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ১১,৮১১ জন শিক্ষার্থী পড়শোনার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া, সরকারিভাবে ২৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন, ৮টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল, ৯টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজিতে মোট ৪,৬৮৪জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারিভাবে ১০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজিতে মোট ২৩,১১৩ শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগে পড়শোনা করতে পারছে।

চট্রগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিলেট মেডিকেল বিশ্বদ্যিালয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ চালু আছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধাতালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে।

নার্সিং সেবা

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের নেয়া নানা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেবা অধিদপ্তর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে আসছে। দেশে বিদ্যমান ৪৩টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটের আসন সংখ্যা ১,০০০টি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ২,৫৮০ জন শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। প্রাক্তন ৭টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করে চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। আরো ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এতে স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর ডিগ্রীর সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩৮টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (১০টি নার্সিং কলেজ এবং ২৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট) ৩-বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৯৭৫টি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এ খাতের বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১' ও 'জাতীয় জনসংখ্যানীতি, ২০১২' এবং 'Bangladesh Health Workforce Strategy, 2015' প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কৌশল (Health Financing Strategy) চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়াও, Drug Information এবং Adverse Drug Reactions Monitoring Cell স্থাপন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ড্রাগ ও ভ্যাকসিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং ফুড কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিও'র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রকে ইতোমধ্যে ইন্টারনেটের আওতায় এনে ই-হেলথ সেবা চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে পিপিপিভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দূর্গম এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্যাকেজ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলস্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০' প্রণয়ন এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও

শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১', 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' এবং 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩', 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়নের পাশাপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েদের মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, যশোর ও রাজশাহীতে মোট ৭টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করছে। কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য আশুলিয়ায় ১২তলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণ করেছে। এছাড়াও, সাভার ও গাজীপুরে গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য দুটি কলোনী নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তাছাড়া, নির্যাতিত নারীদের আইনিসহ সকল প্রকারের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে আত্ম-কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তাদের দেশব্যাপী নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।

শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 'শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের শিশুবান্ধব পরিবেশে সঠিক যত্ন এবং বুদ্ধিভিত্তিক, আবেগিক, ভাষার জ্ঞানের বিকাশ সাধনপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিকেন্দ্রে ৩০ জন করে (৪-৫ বছর বয়সী) ২,১০৯টি কেন্দ্রে Early Leaning Facilities এর মাধ্যমে শিশু বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয়। 'এন্যাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুর অধিকার সুরক্ষায় কাজ করা হচ্ছে। শিশুকে নিপীড়ন, নির্যাতন, সহিংসতা ও শোষণ থেকে রক্ষা করে স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর ৪২টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু একাডেমি থেকে ৫৬টি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য 'শিশু' নামক একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া ৫ খণ্ডে 'শিশু বিশ্বকোষ' প্রকাশ করা হয়েছে। সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৪০টি দুস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের হয়ে কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের আওতায় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এছাড়াও, পরিত্যক্ত নবজাত শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন আছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, 'চাইল্ড সেনসিটিভ

সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পথশিশুদের 'Drop In Center' এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান দানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। এটি মূলত একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুবকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করে ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশেও কাজ করছে জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুব মহিলাদের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। পাহাড়পুর বিহার, মহাস্থানগড়, কান্তজিউ মন্দির, ষাট গম্বুজ মসজিদসহ ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনা ও নিদর্শনসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

এর ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটছে। আটটি জেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কাজ চলছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ১৫টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমির মেরামত ও সংস্কার কাজ, ৬টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া, ৬টি বিভাগীয় শিল্পকলা একাডেমির নির্মাণ কাজ চলমান।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নজরুল ইনস্টিটিউট কাজ করছে। এখন পর্যন্ত নজরুল ইনস্টিটিউট মোট ১১টি বই প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে 'কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮' পাশ হয়েছে। 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে পাঠদান কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র নানা ধরনের বই, গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশসহ সকল শ্রেণির পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে কাজ করছে। বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ করছে।